আমকথা

মাসুম আওয়াল

আমের বাড়ি

এই যে এতসব মজার মজার আম খাচ্ছি, আমরা এই আমের আসল বাড়ি কোথায়? কবে, কখন আমের জন্ম এ বিষয়ে নানা রকম তথ্য পাওয়া যায়। বিষয়টি বিতর্কও আছে। বিজ্ঞানী ড. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে, আমের আদি জন্মস্থান আসাম থেকে থেকে মিয়ানমার পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল। সে অর্থে বাংলাদেশের পূর্বাংশকেও আমের জন্মভূমি বলা যেতে পারে। তবে বর্তমানে দেশের উত্তরাঞ্চলে ও ভারতের মালদহ জেলায় আমের ফলন বেশি হয়। ইতিহাস থেকে জানা যায়, খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭-এ আলেকজান্ডার সিন্ধু উপত্যকায় আম দেখে ও খেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এ সময়ই আম ছড়িয়ে পড়ে মালয় উপদ্বীপ, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ও মাদাগাস্কারে।

চীন পর্যটক হিউয়েন সাং ৬৩২ থেকে ৬৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এ অঞ্চলে ভ্রমণে এসে বাংলার আমকে বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত করেন। ১৩৩১ খ্রিস্টাব্দ থেকে আফ্রিকায় আম চাষ শুরু হয়। এরপর ১৬ শতাব্দীতে পারস্য উপসাগরে, ১৬৯০ সালে ইংল্যান্ডের কাচের ঘরে, ১৭ শতাব্দীতে ইয়েমেনে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে, ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইতালিতে আম চাষের খবর জানা যায়। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের মাটিতে প্রথম আমের আঁটি থেকে গাছ হয়। এভাবেই আম বিশ্ববাসীর দোরগোড়ায় পৌঁছে যায়।

জানা যায়, মোগল সম্রাট আকবর ভারতের শাহবাগের দাঁড়ভাঙায় এক লাখ আমের চারা রোপণ করে উপমহাদেশে প্রথম একটি উন্নত জাতের আম বাগান তৈরি করেন।

আমের নামকরণ

আমের নাম 'আম' কেন? ইংরেজিতে ম্যাংগো বলা হয় কেন? ইংরেজ ও স্প্যানিশরা আমকে ম্যাংগো বলে, পর্তুগিজরা বলে ম্যাংগা। আমকে জার্মান, ইতালিয়ান, গ্রিক, হিব্রু, জাপানি ও ইংরেজি ভাষায় বলা হয় 'ম্যাংগো'। থাইল্যান্ডে বলা হয় 'মা-মুয়াং'। প্রকৃতিপ্রেমী আমিরুল আলম খান বাঙলার ফল বইয়ে আমের আরও ২৩টি নামের উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো আম্র, কামশর, কামবল্লভ, কামাঙ্গ, কীরেষ্ট, কোকিলবাস, কোকিলোৎসব, চ্যুত, নৃপপ্রিয়, পিকরাগ, প্রিয়ঙ্কু, বসন্তদূত, তুঙ্গভীষ্ট, মধুলী, মাদাঢ্য, মাধবদ্রুম, মন্যুথালয়, মধ্বারস, রসাল, সহকার, সুমদন, সিধুরস, সোমধারা। আমের বৈজ্ঞানিক নাম 'ম্যাংগিফেরা ইন্ডিকা'। এ ফল ভারতীয় অঞ্চলের কোথায় প্রথম দেখা গেছে, তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও আমাদের এ জনপদেই যে আমের আদিবাস এ সম্পর্কে আম বিজ্ঞানীরা একমত।

আম যেভাবে ফলের রাজা হলো

প্রবীণদের মুখে আমরা প্রায়ই শুনি আম একটা রাজকীয় ফল। এর পেছনে আছে একটা মজার গল্প। প্রচলিত গল্পটি এমন, রাজ্যের নানা ধরনের লোকজনদের নিয়ে একবার সম্রাট আকবর এক খানাপিনার আয়োজন করলেন। সেখানে ভোজসভায় রাজ্যের মন্ত্রি-সভাসদরা হাজির হলেন। সম্রাট আকবরের প্রিয় সভাসদ বীরবলও উপস্থিত সেখানে। বীরবল এমন খেলেন যে তার পেটে আর জায়গা নেই। বীরবল রাজাকে বললেন, আর কিছু খেতে পারবেন না তিনি। এমন সময় বীরবলের পাত্রে কয়েক টুকরা আম দেওয়া হয়। বীরবল আমের লোভ সামলাতে পারলেন না। আমের সেই টুকরাগুলো তৃপ্তিসহ খেলেন। তিনি বীরবলকে বললেন, 'কী বীরবল, তোমার পেটে নাকি জায়গা নেই? আমগুলো তো ঠিক পেটে চালান করে দিলে!' বীরবল বললেন, 'মহামান্য সম্রাট! আপনি যখন রাস্তা দিয়ে যাওয়া শুরু করেন, তখন রাস্তায় লোকজন থাকলেও তারা সরে যায়, রাস্তা ফাঁকা হয়ে যায়। মহারাজ আপনিও যেমন সম্রাট, তেমনি আম হচ্ছে সম্রাট বা ফলের রাজা। আমার পেট ভরা থাকলেও সে আমার পেটে জায়গা করে নিয়েছে।' এই হলো আমের 'ফলের রাজা' উপাধি পাওয়ার কাহিনি। আম শুধু ফলের রাজাই নয়, আমগাছ বাংলাদেশের জাতীয় বৃক্ষ, আর ভারতের জাতীয় ফল আম।

আমের প্রকারভেদ ও কয়েকটি গল্প

গোপাল ভোগ: অনেক আমের নামের নামের শেষে যুক্ত হয়েছে ভোগ শব্দ। যেমন গোপালভোগ, ক্ষীরভোগ, মোহনভোগ, রাজভোগ, রানিভোগ, লক্ষ্মণভোগ ইত্যাদি। গোপাল ভোগ আমটি বেশ জনপ্রিয় বাংলাদেশে। মাঝারি কালচে রঙের হয়ে থাকে গোপাল ভোগ আম। কাঁচা অবস্থায় ভীষণ

টক। কিন্তু পাকলে রসালো আর মিষ্টি। এটা জ্যৈষ্ঠ মাসের শুরুর দিকেই পাকতে শুরু করে।

ক্ষীরসাপাতি/ হিম সাগর: ২০০ থেকে ২৫০ গ্রাম সাইজের উন্নত আম এটি। মিষ্টি আঁশহীন আম দারুণ জনপ্রিয়। এই আম ব্যাপকভাবে চাষ হয় রাজশাহী এলাকায়। এরই কাছাকাছি জাতটি এখন হিমসাগর বলে পরিচিত। হিম সাগরের জন্য উতলা হয়ে থাকে মানুষ। গোপাল ভোগের পরপরই পাকতে শুরু করে এই আম। ক্ষীরশাপাতি আমের স্বাদের সঙ্গে লেগে আছে দুধের ক্ষীরের স্বাদ, তাই হয়তো ক্ষীরশাপাতি নাম হয়েছে এই আমের।

ল্যাংড়া: আমের রাজা বলা হয় ন্যাংড়া আমকে। এই আমটি পাকলে স্বাদে যেমন মিষ্টি তেমন সুগন্ধে ভরপুর। যে ঘরে রাখা হয় সেই ঘর আমের গন্ধে মৌ মৌ করতে থাকে। মানুষ অনেক বেশি পছন্দ করে এই আম। রাজশাহী শহরে আমেরও চাষ হয় প্রচুর। জানা গেছে, এক ল্যাংড়া বৃদ্ধ বেনারসে প্রথম একটি আমগাছ লাগিয়ে অপূর্ব ঘ্রাণের এক আম ফলান। সেই থেকে আমটার নাম হয়ে যায় ল্যাংড়া।

রানি পসন্দ ও বাদশা পসন্দ: রাজশাহীতে আরও একটি জাতের আম বেশ জনপ্রিয়। সেটি হলো রানি পছন্দ আম। এই আমটি দেখতে অনেকটা গোপাল ভোগ আমের মতোই। না চিনলে গোপাল ভোগ বলে অনেকেই ভুল করতে পারেন। স্বাদে অনন্য এই আম। কোনো রানির পছন্দেও আম ছিল হয় তো এটি। এই যেমন সম্রাট শাহজাহান তার ছেলে আওরঙ্গজেবকে খাওয়ানোর জন্য দাক্ষিণাত্য থেকে যে আম আনিয়েছিলেন, সে আমের নামকরণ করা হয়েছিল বাদশাহপসন্দ। এভাবে দিলপসন্দ, জামাইপসন্দ ইত্যাদি নামের আমও রয়েছে।

ফজলি: ফজলি আম সবার কাছেই বেশ পরিচিত। সাইজে বেশ বড় হয় এই আমটি। একটি আমের ওজনই প্রায় এক কেজির কাছাকাছি। কাঁচা অবস্থাতেও মিষ্টি। পাকলে রসালো ও অনেক বেশি মিষ্টি। অভিজাত এই আমটি পাকে সিজনের শেষের দিকে। কাঁচা অবস্থাতে ঝাল লবণ মাখিয়ে বেশ মজা করে খাওয়া যায় এই আম।

কথিত আছে, মোগল বাদশাহর দরবারে এক বাইজি ছিলেন; তার নাম ছিল ফজল বিবি। বৃদ্ধ বয়সে ফজল বিবিকে বাদশাহ তার আমবাগানের এক কোণে একটা চালা তৈরি করে থাকতে দিয়েছিলেন। একসময় ফজল বিবি মারা যান। ফজল বিবির ঘর ছিল একটি আমগাছের তলায়। ফজল বিবি মারা যাওয়ার পর মানুষ ওই আমের নাম দিল ফজলি আম। এখন আমরা যে ফজলি আম খাই, সেটা সেই আদি গাছের আম। তবে সময়ের বিবর্তনে তার আকার ও স্বাদে বেশ বৈচিত্র্য এসেছে। এ জন্য এখন ফজলিরও অনেক উপজাত সৃষ্টি হয়েছে। যেমন সুরমাই ফজলি, মালদা ফজলি, নাক ফজলি, কালি ফজলি প্রভৃতি।

আশ্বিনা: কথায় আছে, আশ্বিনা, না পাকিলে খাস না। কাঁচা অবস্থায় ভীষণ টক এই আম। পাকলে বেশ মিষ্টি। এই আমটিও পাকে সিজনের শেষের দিকে। অনেকেরই পছন্দের তালিকায় আছে আশ্বিনা আম।

আম্রপালি: গবেষণা করে আমের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করা হচ্ছে। যেমন, ১৯৯৫ সালে সাতক্ষীরা থেকে ভারতে উদ্ভাবিত আম্রপালী ও নীলাম্বরী। এই সময়ের জনপ্রিয় আমগুলোর তালিকায় আছে এই আমটি। সাইজ মাঝারি মানের হলেও স্বাদে অনন্য আম্রপালি। ১৯৯৫ সাল থেকে পরিচিতি পেতে শুরু করে আম্রপালি। তবে জানা যায় এর উৎপত্তি অনেক অনেক আগে। প্রাচীন ভারতের খ্যাতনামা ও শ্রেষ্ঠ নর্তকী ছিলেন আম্রপালি নামের এক নারী। তার নামে আধুনিক হাইব্রিড জাতের আমের নাম রাখা হয়েছে আম্রপালি। আমের মধ্যে আম্রপালিই সবচেয়ে মিষ্টি আম।

হাঁড়িভাঙা: হাঁড়িভাঙা আম যেন রংপুরের অর্থনীতির জন্য আশীর্বাদ হয়ে এসেছে। অতি সুমিষ্ট আঁশহীন হাঁড়িভাঙা আমের চাহিদা বাড়ছে দিন দিন। রংপুর সদর, মিঠাপুকুর ও বদরগঞ্জ উপজেলার এলাকার ফসলি জমি, বাগানসহ উঁচু-নিচু ও পরিত্যক্ত জমিতে চাষ হচ্ছে এই আম। হাঁড়িভাঙা আমের গোড়াপত্তন করেছিলেন খোড়াগাছ ইউনিয়নের তেকানি গ্রামের নফল উদ্দিন পাইকার নামে এক বৃক্ষবিলাসী মানুষ। ১৯৭০ সালে নফল উদ্দিন ১২০ বছর বয়সে মারা যান।

বারি ফোর: নতুন এক প্রজাতির আম এসেছে সেটির নাম 'বারি ফোর'। তিন থেকে ৪ ফুট উচ্চতার এই বারি ফোর গাছে প্রচুর আম আসে। বাংলাদেশের সবখানেই এ জাতটির চাষ করা যায়। পাকা ফলের রং আকর্ষণীয় হলদে। ফলের ওজন গড়ে প্রায় ২০০ গ্রাম। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) 'বারি ফোর আম' উদ্ভাবন করে। এটি আঁশহীন, শাঁস হলুদ, খুব মিষ্টি। কাঁচা আবস্থাতেও মিষ্টি।

বেগুনি আম: ভারতের পুরুলিয়ার আদ্রা শহরের অরবিন্দ পল্লীর এক বাড়িতে দেখা গেছে দেখা গেছে বেগুনি রঙের আম। এ প্রজাতির আম কয়েক বছর ধরেই ভারতের কয়েকটি রাজ্যে চাষ করা হচ্ছে। দেখতে কিছুটা ফজলি আমের মতো এই আম খেতে ও অনেক সুস্বাদু। কাঁচা অবস্থায় এই আমগুলো সবুজ রঙের হলেও, ধীরে ধীরে রঙ পাল্টে বেগুনি রঙ ধারণ করতে থাকে। পাকা অবস্থায় আবার টুকটুকে লাল রঙ। মৌসুমে তিনবার এই প্রজাতির আম রং বদলাতে পারে। এই প্রজাতির আমের ফলন ও বেশ ভালো। উদ্ভিদবিদরা জানান, ব্রাজিল ও ব্রিসবেনে বেগুনি রঙের পামার ফল দেখতে পাওয়া যায়। কী কারণে এই আমের রং বেগুনি হচ্ছে, সেটি বলতে পারেননি কেউ।

নাম না জানা আরও কিছু জাতের আম

জর্দা আম: এই আম সাইজে বেশ ছোট। তিন ইঞ্চির মতো লম্বা। কাঁচা অবস্থায় খুব টক। তবে পাকলে অপূর্ব মিষ্টি স্বাদ। এর বিশেষত্ব হচ্ছে এর কোনো আঁশ হয় না এবং বেশ রসালো। পাকা আমের খোসা ছাড়ানো বেশ সহজ। মুঠোয় নিয়ে একটু চাপ দিলে আঁটি পিছলে বের হয়ে যায়। তবে এই জাতের আম এখন তেমন চোখে পড়ে না।

বেল আম: মেটে সবুজ রঙের আম। পাকলেও তেমনি থাকে। প্রায় ১৫০ থেকে ২০০ গ্রাম ওজনের। তবে এই আমের আঠা একটু বেশি। পাকলে খেতে অনেকটা বেলের স্বাদ পাওয়া যেত বলে একে বেল আম বলে অনেকে।

সফেদা আম: ফজলি আমের মতো লম্বাটে গৌর বর্ণের আম। কাঁচাতেও টক কম, পাকলে সফেদা ফলের মতো মিষ্টি। কোনো আঁশ নেই।

সিন্দুরে আম: গোলাকার ২০০ থেকে ২৫০ গ্রাম সাইজের মেটে সবুজ আম। পোক্ত হলে বা পাকার আগে উপরের অংশে সিন্দুরের গুঁড়ার মত দাগ ফুটে উঠে। দারুণ সুস্বাদু আঁশহীন আম।

আড়া জংলা বা আড়া জন্মানী: মাঝারী ১০০ থেকে ১২৫ গ্রাম সাইজ। কাঁচা রং সবুজ, পাকলে রাঙা হলুদ। পাকলে অপূর্ব সুগন্ধ ও হালকা আঁশযুক্ত রসালো মিষ্টি।

কাল্যা আম: মাঝারি সাইজের কালো রঙের আম। কাঁচায় মহা টক। পাকলে দারুণ স্বাদের মিষ্টি। একটু আঁশযুক্ত। এখন খুব একটা দেখা যায় না।

তুরতুরি আম: বিশাল গাছে লিচুর মতো ফলন হয়। পাকার সময় হলে মিনিটে মিনিটে আম পড়ত বলে নাম ছিল তুরতুরি আম। এটা দেশি বা বুনো জাতের আম। চমৎকার রসালো মিষ্টি।

এ ছাড়া শত শত দেশি এবং বুনো জাতের নাম না জানা আম রয়েছে। এইসব বিভিন্ন জাতের আম প্রায় বিলুপ্ত। বাণিজ্যিকভাবে সফল আমগুলোই এখন বেশি চাষ করা হয়। সব মিলিয়ে আমাদের উপমহাদেশে প্রায় ১ হাজার জাতের আম রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞদের মত। চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলায় এখনো আমের অনেক জাতবৈচিত্র্য দেখা যায়। স্থানীয় সেসব জাতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ক্ষীরভোগ, মোহনভোগ, রাজভোগ, রানিভোগ, সিন্দুরা, সুবর্ণরেখা, কুয়াপাহাড়ি, চিনিমিছরি, জগমোহিনী, রাখালভোগ, রাঙাগুড়ি, গোবিন্দভোগ, তোতাপুরী, মিছরিকান্ত, জালিবান্ধা, বোম্বাই, ভুতো বোম্বাই, পাহাড়িয়া, গোলাপখাস, কাকাতুয়া, দাদভোগ, চম্পা, সূর্যপুরী, কাঁচামিঠা, কলামোচা, শীতলপাটি, গোলাপবাস, কিষানভোগ, বান্দিগুড়ি, রাংগোয়াই, ভাদুড়িগুটি, বনখাসা, বউ ফুসলানি, ক্ষীরমন, দুধসর, রংভিলা, পারিজা, আনোয়ারা, দিলশাদ, মল্লিকা, বেগমবাহার, পূজারীভোগ, পলকপুরী, রাজলক্ষ্মী, দুধকুমারী, শ্যামলতা, খাট্টাশে, জাওনা, দমমিছরি, মিছরিমালা, মিছরিবসন্ত, মেসোভোলানি, আনোয়ারা, পলকপুরী, ফুনিয়া, গোলাপবাস, বাতাসাভোগ, ইটাকালি, গোল্লাছুট, পোল্লাদাগী, মোহনবাঁশি, পরানভোগ, বিড়া, ভারতী, বেগমপসন্দ, রাজাপসন্দ, বনখাসা, বাগানপল্লি, কালিগুটি, পাকচারা, কালিয়াভোগ, কোহিতুর, কালিগুলি প্রভৃতি।

এর পাশাপাশি এ দেশে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলের জার্মপ্লাজম সেন্টার থেকে উদ্ভাবিত হয়েছে আমের অনেক আধুনিক ও উন্নত জাত।

আম চাষের ইতিহাস

কৃষিবিদ ও প্রকৃতিবিষয়ক লেখক মৃত্যুঞ্জয় রায় তার আম নিয়ে লেখা একটি প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন আম চাষের ইতিহাস। সেই প্রবন্ধের কিছু অংশ পাঠ করা যেতে পারে- 'বিভিন্ন সংস্কৃত সাহিত্যে প্রায় ৬ হাজার বছর আগেও কোনো কোনো অঞ্চলে আম চাষের উল্লেখ পাওয়া যায়। আনুমানিক ৫০০ থেকে ৪০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে আম পূর্ব এশিয়ায় প্রবর্তিত হয়। ১৫ শতকে আম যায় ফিলিপাইন ও এরপর আফ্রিকায়।
প্রাচীনকালে নির্মিত ভারতের অজন্তা-ইলোরার গুহাচিত্রেও রয়েছে আমগাছের অপূর্ব সৌন্দর্যচিত্র। ইতিহাসে উল্লেখ আছে, মহাবীর আলেকজান্ডার খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে সিন্ধু উপত্যকায় এসে সুদৃশ্য আমবাগান দেখে মুগ্ধ হন। বিভিন্ন সময়ে এ দেশে আসা পর্যটকেরাও তাদের ভ্রমণকাহিনিতে আমের কথা উল্লেখ করেছেন চীনা পর্যটক হিউয়েন সাং ৬৩২ থেকে ৬৪৫ সালের মধ্যে এ দেশ ভ্রমণে আসেন। তিনিই প্রথম তার ভ্রমণকাহিনিতে আমের কথা বর্ণনা করে বহির্বিশ্বে আমকে সরস ফল হিসেবে পরিচিত করেন। ভারতবর্ষে পাল রাজাদের আমলে উত্তর-পূর্ব ভারতে ব্যাপকভাবে আমের চাষ করা হতো এবং মথুরা থেকে আসাম পর্যন্ত ভালো আম উৎপাদিত হতো।'

রাজা-বাদশাহদের প্রিয় ফল

ভারতে মুসলিম শাসনামলে মূলত আম চাষ ও আমবাগান তৈরি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। দিল্লির সুলতান কায়কোবাদ, জালালুদ্দিন, আলাউদ্দিন খিলজি, গিয়াসউদ্দিন তুঘলক; সবাই আম পছন্দ করতেন। আমের নতুন নতুন জাত তৈরি ও বাহারি রঙের নানা স্বাদের আমের চাষ শুরু হয় মোগল আমলে। আমের বহু জাতের নামকরণও করা হয় সে আমলে। সে সময় একজন মোগল উদ্যানতত্ত্ববিদ আমের পাঁচ শতাধিক জাত উদ্ভাবন করেন। মোগল শাসকেরা বিভিন্ন স্থানে সেসব জাতের গাছ লাগিয়ে আমবাগান সৃষ্টি করেন। সম্রাট বাবর সে সময় আমকে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ফল বলে আখ্যায়িত করেন। সম্রাট আকবরের প্রচেষ্টায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে বিহারের দ্বারভাঙায় ১ লাখ আমগাছ লাগিয়ে এক বিশাল আমবাগান সৃষ্টি করা হয়, যা 'লাখবাগ' নামে পরিচিত। লাখবাগে প্রথম আমের কলম করার পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়। এর আগে আঁটির চারা লাগিয়েই আমবাগান করা হতো।

লালবাগের আমবাগান

সম্রাট আকবরই প্রথম ব্যক্তি, যিনি এই উপমহাদেশে প্রথম পরিকল্পিতভাবে আমবাগান তৈরিতে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। সম্রাট আকবরের দীর্ঘ খাদ্যতালিকার শীর্ষে ছিল আম। রাজধানী দিল্লির রাজ দরবারে যাতে সারা বছর আমের সরবরাহ থাকে, তিনি সে ব্যবস্থা করেছিলেন। নবাবি আমলে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় অনেক আমবাগান গড়ে ওঠে। মুর্শিদাবাদের নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় ও প্রচেষ্টায় মুর্শিদাবাদের লালবাগের আমবাগানে ২৫০টির বেশি ভালো জাতের আম তৈরি করা হয়। এ বাগান থেকে উন্নত সেসব জাতের আমের চারা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় লালবাগ বাগানের প্রভাবে ব্যাপকভাবে আম চাষের প্রসার ঘটে। নাটোরে রানি ভবানীর কাছারি বাড়ির পাশে রয়েছে একটি আমবাগান। সেখান থেকে রানি ভবানীর জন্য উৎপাদিত হতো উন্নত জাতের আম। নাটোর সদরের গদাই নদের তীরে ছাতনী গ্রামে ডা. মনির উদ্দিন ব্রিটিশ আমলে প্রায় ১০০ বিঘা জমির ওপরে একটি আমবাগান গড়ে তোলেন। তিনি মুর্শিদাবাদের লালবাগ বাগান থেকেও অনেক চারা এনে সেখানে রোপণ করেন। তাই সে বাগানটি এ দেশে বিভিন্ন জাতের আম সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। প্রাচীন এসব বাগানে সাক্ষী হয়ে আছে বেশ কিছু শতবর্ষী আমগাছ। ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার মন্ডুমালা গ্রামে রয়েছে প্রায় দেড়শ বছর বয়সী সূর্যপুরী জাতের এক বিশাল আমগাছ, যাকে বলা হয় এশিয়ার বৃহত্তম আমগাছ।

'রাজার বাগান' চেন?

ব্রিটিশ আমলে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার কানসাটে ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার জমিদার মহারাজ শশীকান্ত আচার্য রায়বাহাদুর চৌধুরী প্রায় ২০০ বিঘার ওপরে একটি আমবাগান গড়ে তোলেন, যা 'রাজার বাগান' নামে খ্যাত। বাগানটির বয়স ২০০ বছরের বেশি হলেও এখনো টিকে আছে। ময়মনসিংহের মহারাজা ব্রিটিশ আমলে সেখানে যেতেনও নিজে বাগানের দেখাশোনা করতে। চাঁপাইনবাবগঞ্জের মনাকশায় আরও একটি ঐতিহাসিক বাগান রয়েছে, যেটি 'চৌধুরীদের বাগান' নামে পরিচিত। প্রায় ১৫০ বছর আগে ৩৫ বিঘা জমির ওপরে মনাকশার জমিদার শাহ মোহাম্মদ চৌধুরী বাগানটি তৈরি করেন। তিনি মোগল সম্রাট আকবরের দ্বারভাঙ্গা জেলার লাখবাগ, মহিশুরের টিপু সুলতানের আমবাগান ও মুর্শিদাবাদের নবাবদের আমবাগান লালবাগ থেকে বিভিন্ন জাতের আমগাছ এনে সেখানে লাগান। সে বাগানে ৭০টির বেশি জাতের আমগাছ রয়েছে। পর্তুগিজরা অনেকবার এ দেশ থেকে সরস ফল আমের চাষকে তাদের দেশে নেওয়ার চেষ্টা করে বিফল হয়েছে। জাহাজে করে আঁটি নিয়ে পুঁতে এত দূরে আমগাছ তৈরি করা সম্ভব ছিল না।

চারা তৈরি ও কলম করার কৌশল আবিষ্কারের পরই আসলে পৃথিবীর নানা দেশে ভারতবর্ষ থেকে আমের বিস্তার শুরু হয়। আনুমানিক ১৭০০ সালে এ উপমহাদেশ থেকে ব্রাজিলে প্রথম আমগাছ রোপণ করা হয়। সেখান থেকে ১৭৪০ সালে আমগাছ যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজে। বর্তমানে ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে আফ্রিকা পর্যন্ত অনেক দেশেই আম চাষ করা হয়। তবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হলো আম উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র ভারত, বাংলাদেশ, অস্ট্রেলিয়া, থাইল্যান্ড প্রভৃতি পৃথিবীর অন্যতম প্রধান আম উৎপাদনকারী দেশ। বাণিজ্যিক আম উৎপাদনে এখন ভারত ও থাইল্যান্ড আমাদের দেশের চেয়ে বেশ এগিয়ে গেছে। বিশ্ব আম উৎপাদনে বর্তমানে শীর্ষ দেশ ভারত ও বাংলাদেশের অবস্থান নবম।

আমের গুণ

পুষ্টি উপাদানে ভরপুর উপকারী ফল আম। এতে আছে প্রচুর খনিজ লবণ এবং বিভিন্ন ভিটামিন। ভিটামিন এ, ভিটামিন সি ও ভিটামিন বি৬ রয়েছে আমে। এছাড়া আছে অ্যামাইনো অ্যাসিড, পটাসিয়াম ও কপার। আমে থাকা বিটা ক্যারোটিন, লুশিয়েন জিলাইক অ্যাসিড, আলফা ক্যারোটিন, পলি পিথানল কিউরেচিন কাম্ফারল, ক্যফিক অ্যাসিড ইত্যাদিও স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। বর্তমানে অন্যতম ভয়ের কারণ হচ্ছে হৃদরোগ। এই রোগ থেকে বাঁচতে আম খাওয়া যেতে পারে। কারণ এতে আছে প্রচুর বিটা ক্যারোটিন। এটি ভিটামিন এ এর উৎস। আম খেলে হৃদরোগ, ভুলে যাওয়ার সমস্যা, আথ্রাইটিসের মতো রোগ দূরে থাকে। শরীরে মিনারেলের ঘাটতি দেখা দিলে নানা অসুখ বাসা বাঁধতে পারে। আম খেলে এই ঘাটতি অনেকটাই পূরণ হয়। কারণ আমে আছে প্রচুর পটাশিয়াম। যেকোনো পরিশ্রমের পর আম খেলে পটাশিয়াম ঘাটতি অনেকটাই পূরণ হয়। শরীর থেকে বের হয়ে যাওয়া প্রয়োজনীয় লবণের ঘাটতিও পূরণ করে আম। শিশুকে আম খেতে দেওয়া উচিত কারণ এটি স্মৃতিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। আমে আছে গ্লুটামিক অ্যাসিড যা মস্তিষ্কের কোষ উজ্জীবিত করে থাকে। ফলে বাড়ে মনোযোগ। তাই মস্তিষ্কের চাপ কমাতে আম খাওয়া যেতে পারে। ঠান্ডাজনিত সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে আম। আমে আছে প্রচুর ভিটামিন এ এবং ডি। এই দুই ভিটামিন ঠান্ডাজনিত সমস্যা দ্রুত উপশম করে। তাই ঠান্ডা কিংবা ফ্লু দেখা দিলে আম খেতে পারেন। এটি আপনাকে সুস্থ হতে সাহায্য করবে। হজমের নানা সমস্যায় ভুগে থাকেন অনেকেই। সেসব সমস্যা থেকেও মুক্তি পেতে সাহায্য করতে পারে আম। এই ফলে আছে প্রচুর আঁশ। তাই আম খেলে হজম প্রক্রিয়াকে উন্নত হয়। কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো সমস্যা তাড়াতেও আম সমান উপকারী।

শেষ কথা: তবুও সাবধান

আম উপকারী ফল হলেও এটি একসঙ্গে খুব বেশি খাওয়া ঠিক নয়। কারণ পাকা আমে চিনির পরিমাণ বেশি থাকে। তাই এই ফল খেলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে যায়। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে বেশি আম খাওয়া ক্ষতিকর। যাদের ডায়াবেটিস আছে তারা আম খাওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। একটি মাঝারি আমে তিন গ্রাম ফাইবার থাকে। তাই একসঙ্গে বেশি আম খেলে বদ হজম বা ডায়েরিয়া হওয়ার ভয় থাকে।